আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ও ব্যঙ্গকাহিনী

ড. অন্তরা চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়,
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

ABSTRACT:-

সাহিত্যে হাস্যরস যেভাবে পরিবেশিত হয় তার অনেক রূপভেদ আছে। সাধারণ হাস্যরসের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা যায় যে আমাদের হাসি-তামাশা-রঙ্গরস-ভাঁড়ামি- এ সকলের একটা সাধারণ গুণ এই যে এদের মধ্যে যে হাসির উত্তেজনা বা আমোদ আছে তা সম্পূর্ণ বাইরের বিষয়। কাজ বা কথার চাতুর্যই এর প্রাণ। একে 'ফান'(FUN) বলা হয়। 'উইট'(WIT)বুদ্ধিপ্রধান বাক-চাতুর্যময় রসিকতা। 'উইট'এর মধ্যে মার্জিত বুদ্ধি বা রুচির প্রকাশ হয়। কিন্তু 'স্যাটায়ার' (SATIRE)ও 'আইরনি'(IRONY)এই ধরণের নিছক আমোদের বা হাসির বিষয় নয়। এতে একটি বক্রভঙ্গি বা শ্লেষ থাকে। 'স্যাটায়ার' স্পষ্ট ও খোলাখুলি বিদ্রুপ হলেও যখন তার সঙ্গে একটু বক্রভঙ্গি যুক্ত হয় তখন তাকে সারকাজম বা টিটকারি বলা যেতে পারে। 'আইরনি' শুধু চাপা বিদ্রুপ নয়- বিদ্রুপের অন্তরালে ব্যথা ও মর্ম পীড়াও থাকতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন ও পুরাতনের সন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিওয়ালাদের ঐতিহ্যেই লালিত হয়েছিলেন। তিনি হাস্যরসিকের বস্তুনিষ্ঠ,সমাজসচেতন দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী ছিলেন। ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলে’ যে হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর অনেকটাই বুদ্ধিপ্রধান বাকচাতুর্য নির্ভর। তাঁর বৈদগ্ধ্যপূর্ণ রসিকতায় অবশ্য মুকুন্দরামের কৌতুকপ্রিয় হিউমারের মমতাস্নিগ্ধ প্রাণময়তার স্বাদ পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'জ্যোতিদাদা' এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কয়েকটি হাস্য রসাত্মক রচনা লিখেছেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' রচনাটিকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর দ্বিতীয় হাস্যরসাত্মক রচনা "এমন কর্ম আর করব না"— পরে ‘অলীকবাবু’ নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের সরস পরিহাসের লক্ষ্য দুটি-মূর্খ অলীকের মিথ্যাভাষণ এবং নভেলী নায়িকা হেমাঙ্গিনীর রোমান্সপ্রিয়তা। ঘটনার পরম কৌতুকাবহ বৈচিত্র্য গদার দ্বারা ঘটেছে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে সামাজিক মতিভ্রমের বিষয়টিকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণের

চেষ্টা করেছেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের পর বাংলা নাট্যসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' 'ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে রচিত হয়। এই দুটি গ্রন্থ সার্থক সাহিত্য রসোত্তীর্ণ প্রহসনমূলক রচনা। ছোটদের জন্য লিখিত সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' কৌতুক নাটকটি তাঁর ব্যঙ্গাশ্রিত হাস্যরসে পরিণত পাঠকদের মুগ্ধ করে। 'আবোল তাবোল', 'ঝালাপালা', 'লক্ষণের শক্তিশেল' নাটকগুলির অনাবিল হাস্যরস শুধু ছোটদের নয়,আবাল বৃদ্ধ-বনিতার নিকট আজও সমপরিমাণে উপভোগ্য। বাংলা সাহিত্যে 'বীরবল' ছদ্মনামধারী প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় বাগবৈদগ্ধ্যের উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তার রচনায় উইট বা বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা শানিত ও সংহত বাকচাতুর্যাশ্রয়ী ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বা স্যাটায়ার যেভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাতে তাঁর ভাবালুতাবর্জিত, নির্মোহ, বিচারনিষ্ঠ মানসের বৈশিষ্ট্যই আমরা অনুভব করি। তাঁর অভিজাত রুচি নির্মল হাসির খোরাক না হলেও চিন্তাভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সংখ্যায় অল্প হলেও যে সমস্ত লেখক বাংলা সাহিত্যকে হাস্যরসের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছেন তাঁর মধ্যে শংকরীপ্রসাদ বসুর 'নট আউট', হীরেন্দ্রনাথ দত্তর 'ইন্দ্রজিতের আসর', সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'রসে বশে', বুদ্ধদেব গুহর 'ঋজুদাসমগ্র', আশাপূর্ণা দেবীর 'হারজিৎ', 'পল্টুদার বড়দা', প্রভৃতি রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অভাবিত পূর্ব সমস্যা ও দুরবস্থায় হাস্যরসাত্মক রচনার অনেকটা স্তিমিত রূপ দেখা যায়। জাতীয় জীবনের নানা বিপর্যয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে মানুষের জীবনের সহনশীলতা ও রসবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। তাই স্বাভাবিক সুস্থতা বা নিরুদ্বিগ্নতা ফিরে না এলে স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসের প্রবাহন সম্ভব হবেনা। তাই এই মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের স্রোত শীর্ণ।

KEYWORDS:- হাসির রচনাগুলি বৈদগ্ধ্যপূর্ণ শ্লেষপূর্ণ হয়েও সরসতা ও নির্মলতার আকর।

মূল প্রবন্ধ

সংস্কৃত আলংকারিকরা সাহিত্যের নয়টি রসের মধ্যে হাস্যকে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছেন। বস্তুতঃ হাসি যেমন মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও পরম প্রিয় বস্তু, তেমনই হাস্যরসের গল্প, কবিতা ও নাটকও সহজেই সাধারণের হৃদয়হরণ করে। জীবনের যা কিছু অসঙ্গত তা সহজেই হাস্যরসের আধার হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের তেমন কোন মর্যাদা ছিল না। সেখানে আদিরস ও করুণরসের আধিক্য দেখা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের পাত্র ছিলেন বিদূষক। সে রাজার বয়স্য বা পারিষদ হয়ে অন্যান্য পরিষদবর্গের হাস্যকৌতুক উদ্রেক করত। তাঁর স্থূল রসিকতা সকলের মনে কৌতুক ও প্রীতি উৎপাদন করত। বিদূষক বিনা সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের তেমন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নেই। কোন কোন স্থানে পরিহাস, শ্লেষ ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ মন্তব্যের মধ্যেও হাস্যরসের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণতা বাঁধা ধরা নিয়মাবলী ও মার্জিত রুচির জন্য ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরস তেমন জমে উঠতে পারেনি। হাস্যরস বা ব্যঙ্গরসের মাত্রা বা সীমারেখাটি কি, হাসির অনুভূতির স্বরূপটি কি, হাসি- তামাশা- মশকরা-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুক ভাঁড়ামি-রঙ্গরস প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের হাস্যরসের পার্থক্য সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরেই সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে।

সাহিত্যে হাস্যরস যেভাবে পরিবেশিত হয় তার অনেক রূপভেদ আছে। সাধারণ হাস্যরসের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা যায় যে আমাদের হাসি-তামাশা-রঙ্গরস-ভাঁড়ামি- এ সকলের একটা সাধারণ গুণ এই যে এদের মধ্যে যে হাসির উত্তেজনা বা আমোদ আছে তা সম্পূর্ণ বাইরের বিষয়। কাজ বা কথার চাতুর্যই এর প্রাণ। একে 'ফান'(FUN) বলা হয়। 'উইট'(WIT)বুদ্ধিপ্রধান বাক-চাতুর্যময় রসিকতা। 'উইট'এর মধ্যে মার্জিত বুদ্ধি বা রুচির প্রকাশ হয়। কিন্তু 'স্যাটায়ার' (SATIRE)ও 'আইরনি'(IRONY)এই ধরণের নিছক আমোদের বা হাসির বিষয় নয়। এতে একটি বক্রভঙ্গি বা শ্লেষ থাকে। 'স্যাটায়ার' স্পষ্ট ও খোলাখুলি বিদ্রুপ হলেও যখন তার সঙ্গে একটু বক্রভঙ্গি যুক্ত হয় তখন তাকে সারকাজম বা টিটকারি বলা যেতে পারে। 'আইরনি' শুধু চাপা বিদ্রুপ নয়- বিদ্রুপের অন্তরালে ব্যথা ও মর্ম পীড়াও থাকতে পারে।

এইসব হাস্যরসের মধ্যে 'হিউমারই'(Humour)সর্বশ্রেষ্ঠ। হিউমার বা ফান-এর মধ্যে জ্বালা-বিদ্বেষহীন অনাবিল জীবনরস ও রসিকতা থাকে। জগৎ ও জীবনের প্রতি নির্লিপ্ত অথচ সহৃদয় মনোভাবই হিউমারের মূল কথা। হিউমারের সঙ্গে যদি রসবোধের উপাদান থাকে তবুও হিউমারের নির্মল আনন্দকে আচ্ছন্ন করে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে; সংস্কৃত আলংকারিকরা হাস্যরসকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেননি। বাঙলা প্রাচীন সাহিত্যেও সমাজের পরিবেশ হাস্যরস সৃষ্টির উপযোগী ছিল না। বাস্তব জীবনবোধ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকলে হাস্যরস সার্থকভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। বাঙালি ধর্মপ্রাণ ও অধ্যাত্মবিলাসী জাতি। জাগতিক জীবন অপেক্ষা পরমার্থিক জীবন তাকে অধিক আকর্ষণ করেছে। যে চিত্ত সর্বদা দেবতার মাহাত্ম্য ও অলৌকিক কার্যকারণতত্ত্বে নিমগ্ন তা কঠিন মৃত্তিকাময় মনুষ্য সমাজের বিকৃতি,বিভ্রান্তি ও বিপর্যয় লক্ষ্য করতে অপারগ। তাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বৈষ্ণব পদাবলীতেও হাস্যরসের চিহ্নমাত্র নেই। দেবলীলার মধ্যে হাস্যরস নেই, আধ্যাত্মিক ভক্তি ও শক্তিসাধনার মধ্যেও হাস্যরস নেই। কেবল যেখানে দেবতা মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছেন সেখানে মানবিক অসঙ্গতির সূত্রে কিছুটা হলেও হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। শিব যেখানে শাঁখারী বা কৃষক, চণ্ডী যেখানে কুলবধূর বেশ ধারণ করে ফুল্লরার ঈর্ষা উদ্রেক করেছেন অথবা দেবতারা যেখানে বিধর্মীর পোশাকে ভূষিত হয়েছেন,সেসব স্থলেই কিঞ্চিৎ হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। এই হাস্যরস বা ব্যঙ্গ মাত্রা ও উৎকর্ষ উভয় দিক থেকেই অতি নগণ্য। মধ্যযুগের কাব্যে গ্রাম্য অমার্জিত ভাঁড়ামিই পরিবেশন করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশে বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'- এ এরই প্রতিধ্বনি দেখতে পাই-

"হাসি বলে শূলপাণি আ্য়ো ভান্ডিতে আমি জানি
মধ্যে দাঁড়াইবো লেংটা হইয়া।
দেখিয়া আমার ঠান   আয়োর উড়িবে প্রাণ
লজ্জা পাইয়া সরে যাইবে ঘরে গিয়া"[১]

এই গতানুগতিক ধারার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম। মধ্যযুগের প্রথাবদ্ধ দেবনির্ভরতার একচ্ছত্র প্রাধান্যের মধ্যেও মুকুন্দরাম আশ্চর্য প্রসন্ন জীবনরস ও রসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কবিদের মধ্যে যথার্থ হিউমারিস্ট এর দৃষ্টিভঙ্গি একমাত্র তাঁরই মধ্যে ছিল। এই প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন- "মুকুন্দরামের বস্তুনিষ্ঠতা ইংরেজ চারণকবি চসারের পর্যায়ের,জীবনের সমস্ত ত্রুটি, অসঙ্গতি, অকিঞ্চিৎকরতা সত্ত্বেও তা প্রচুর আনন্দরসের উৎস ও উপভোগ্য। তার কারণ যে তিনি স্বয়ং আবিষ্কার করেছেন ও পাঠককে অনুভব করিয়েছেন। প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা বর্ণনায় লেখনীকে বিদ্রুপের দ্রাবকরসে না ডুবিয়ে তাকে এক শান্ত, কৌতুকস্মিত বিস্ময়বোধ দ্বারা অভিষিক্ত করেছেন। অত্যাচারীদের প্রতি তিনি রক্তচক্ষু অভিশাপ বর্ষণ করেননি, সমস্ত ব্যাপারটির অহেতুক অসংগতিটি তাঁর মনে এক করুণামিশ্রিত কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সৃষ্টি করেছে। নিজের কথা বলতে গিয়েও তাঁর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক রহস্যপ্রিয়তা অশ্রু বাষ্পোচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়নি। 'তৈল বিনা কৈলু স্নান, করিলু উদক, পান, শিশু কান্দে ওদনের তরে'— দারিদ্র্যের এই মর্মভেদী অনুভূতি তাঁর শিল্পজনোচিত প্রশান্তি ও সার্বভৌমতা বোধকে বিচলিত করেনি।"

বণিক মুরারী শীল ও তার স্ত্রীর এবং দুর্বলা দাসীর ধূর্ততা, ভাঁড়ু দত্তের শঠতা ব্যাধ কালকেতুর রূপ ও আচার-আচরণ বর্ণনা সর্বত্র জীবনরসিক কবি মুকুন্দরামের স্নিগ্ধ কৌতুক রসোজ্জ্বল দৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। কালকেতুর ভোজন বর্ণনায়—

"মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বাঁন্ধিলেন ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে।।
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ।
ছয় হান্ডি মুহুরি সুপ মিথ্যা তথি লাউ।।[২]

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' যে হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর অনেকটাই বুদ্ধিপ্রধান বাকচাতুর্য নির্ভর। তাঁর বৈদগ্ধ্যপূর্ণ রসিকতায় অবশ্য মুকুন্দরামের কৌতুকপ্রিয় হিউমারের মমতাস্নিগ্ধ প্রাণময়তার স্বাদ পাওয়া যায় না।

কবিওয়ালাদের গানে কবিতায় যে বাকযুদ্ধ চলতো, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ছিল তার প্রধানতম উপকরণ। কবিগানের হাস্যরস অত্যন্ত নিম্নস্তরের ,তবুও কখনও কখনও তাদের পরিহাস ব্যঙ্গ বিদ্রূপে একজাতীয় চাতুর্য, বচন,কৌশল ও দেশীয় রসিকতার যে উদাহরণ পাওয়া যায় তার একটি নিজস্ব মূল্য আছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যেই যথার্থ হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন ও পুরাতনের সন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিওয়ালাদের ঐতিহ্যেই লালিত হয়েছিলেন। তিনি হাস্যরসিকের বস্তুনিষ্ঠ,সমাজসচেতন দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী ছিলেন। বাঙালি জীবনের

বিভিন্ন দিক, বাস্তব জগতের অনেক খুঁটিনাটি আপাততুচ্ছ বিষয় নিয়েও গুপ্ত কবি কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছেন। হাস্যরসিক জীবনকে দেখেন তীক্ষ্ণ ও তির্যক ভাবে। তাই ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ঊনিশ শতকের বাংলাদেশের পটভূমিকাতেই রূপলাভ করা সম্ভবপর ছিল।

'তাঁর রঙ্গরসের প্রকতি ছিল খাঁটি বাঙালি, যে-বাঙালী প্রকৃতি বস্তুত নতুন সাহিত্যে পরিবর্তিত হয়েছে'।[৩]

তাই ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য-কবিতায় সমসাময়িক সমাজের আচার-ব্যবহার,বিকৃতি, অসংগতি. ব্যঙ্গের মাধ্যমে ধরা পড়েছে। তাঁর ব্যঙ্গ বিদ্রুপের দু একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

"ধন্য যে বোতলবাসি ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার বল।।"

তপস্বীর চিত্রকল্পে এবং ছদ্ম প্রশস্তিতে তোপসে মাছ নিয়ে কবি কবিতা রচনা করেছেন—

"কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁফদাড়ি তপস্বীর প্রায়।।"

'পৌষ পার্বণ'কবিতায় অন্তঃপুরবাসিনী বাঙালি নারীদের কলহ,ক্ষুদ্র ঈর্ষা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি যে সকল চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন তাঁর কৌতুকরস আকর্ষণীয়। তাঁর রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক

কবিতাগুলির প্রবণতা কৌতুকরস সৃষ্টির দিকে হলেও বিশেষ ঝোঁক অনুপ্রাস-যমক-অলংকারের সূক্ষ্ম প্রয়োগে। তাঁর 'পাঁঠা', 'তোপসে মাছ', 'আনারস' কবিতাগুলি হাস্যরস ও ব্যঙ্গাত্মক রচনার সার্থক নিদর্শন। উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্য লেখকদের নকশা জাতীয় বা ব্যঙ্গার্থক রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ার দেখা দেয়। ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যঙ্গ কবিতার যে ধারার সূত্রপাত করেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাস্যরসাত্মক কবিতায় সেই ধারারই প্রতিফলন দেখা যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কলিকাতা কমলালয়’ ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাঙ্গালী মেয়ে’ হালকা লাচারী ছন্দে ও কথ্য ভাষায় লেখা। কবিতাগুলিতে ব্যঙ্গরস থাকলেও তা কখনোই মর্মভেদী নয়। কবির সহৃদয়তা ও সরল কৌতুকহাস্যের স্নিগ্ধতা রচনাবলীকে সমৃদ্ধ করেছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নকশা" (১৮৬১) বাংলা সাহিত্যের একখানি অদ্বিতীয় হাস্যরসাত্মক সৃষ্টি। ‘কথ্যরীতির গদ্যের অনুশীলন, সমাজ-বাস্তবতা, চিত্রন-নৈপুণ্য, অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌতুক সৃষ্টিতে এই গ্রন্থটি যথার্থই ব্যঙ্গ কাহিনীর জন্ম দিয়েছে’।[৪]
'আপনার মুখ আপনি দেখ’ ব্যঙ্গ কাহিনীটির রচয়িতা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৩)। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন ‘হুতোম প্যাঁচার’ মহাশয়ের অনুগামী হয়ে লেখনী ধারণ করেছেন। নকশাসুলভ চিত্রকলার চেয়ে চরিত্র রচনায় তিনি অধিকতর সার্থক। নকশা বা ব্যঙ্গকাহিনী রচনার তাঁর ভাঁড়ামি-দক্ষতা, প্রতিপালকের মনোরঞ্জনের কারণে মুখ ভ্যাঙচানো, তৎকালীন বাঙালি সমাজের বিকৃত স্তরের চরিত্র চিত্রাঙ্কন ,বটতলার প্রকাশকদের সাহিত্য-আদর্শের অনুকরণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য গুলি তাঁর ব্যঙ্গ কাহিনীটিকে অবশ্যই স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে ।
তাঁর দ্বিতীয় 'প্রহসন বা ব্যঙ্গ কাহিনী ‘কনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধে'(১৮৬৩)।পরবর্তী প্রহসন বা ব্যঙ্গ রসাত্মক লেখা "কিছু কিছু বুঝি"। গ্রন্থটি মূলতঃ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কুৎসার বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত 'হরিদাসের গুপ্তকথা' (চার খণ্ড) 'হুতোম প্যাঁচার নকশার'অনুকরণে লিখিত হলেও স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। কলকাতার কথ্য ভাষায় লেখা ও

দেশীয় ছাঁচে ঢালা ও যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন লেখা বলেই 'হরিদাসের গুপ্তকথা' দীর্ঘদিন ধরে সমাদৃত ছিল।

'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক ব্যঙ্গপ্রধান লেখা লিখেছেন। উনিশ শতকের শেষ পাদে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে অসংগতি ও অসামঞ্জস্যের সমাবেশ হয়েছিল তাকে ব্যঙ্গে-রঙ্গে- বিদ্রুপে পীড়িত করেই বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। 'কল্পতরু' বাংলা সাহিত্যের প্রথম ব্যঙ্গ উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৮৭৮। এরকম উপাদেয় গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে খুব কমই রচিত হয়েছে। তাঁর 'ভারত উদ্ধার' (২ জানুয়ারি ১৮৭৮), যা তিনি খণ্ডকাব্য হিসেবে প্রচার করেছিলেন, তা আদতে একটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গকাব্য। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফাঁক ও ফাঁকি, কপট দেশপ্রেম সরস ও মর্মদাহী কৌতুকে এখানে উপস্থাপিত করেছেন। দেশপ্রেমে ও জাতীয়তাবোধে যে চূড়ান্ত তঞ্চকতা,তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু শব্দ পরিবর্তিত করে নিলে 'ভারত উদ্ধার'কাব্যের তীর্যক বক্তব্য আজও মূল্যহীন বলে মনে হয় না। 'পঞ্চানন্দ' ইন্দ্রনাথের অতুলনীয় কীর্তি। এখানে তিনি পঞ্চানন্দ ছদ্মনামে গদ্যে-পদ্যে যেসব সরস চুটকিগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি এক কথায় অনবদ্য।

বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বসু চার ভাগে সমাপ্ত 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬-৮৯) উপন্যাসটি রচনা করেন। এই বিরাট উপন্যাসের মূল উপজীব্য ব্যঙ্গ। তবে তাঁর ব্যঙ্গে ঝাঁজ বেশি ব্যক্তিগত আক্রমণের স্পৃহা অত্যধিক,রুচি অমার্জিত স্থূলতায়
কখনও কখনও ভারাক্রান্ত। ইনি সমাজের ভন্ডামি, অন্যায়কে তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গে জর্জরিত করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ বাণ হেনেছেন রক্ষণশীলতার নির্ভার দূর্গে দাঁড়িয়ে। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর অকারণ বিদ্বেষ ছিল। 'মডেল ভগিনী' তে তাঁর উদাহরণ আছে—

"সেই প্রকাণ্ড হরিতাল- রঙের হলে কি দেখিলাম ? দেখিলাম, এক পীনোন্নত পয়োধরা, আলুলায়িত কেশ, বিবিধ বর্ণের বেশভূষিতা বর্ণিনী রমণী একাকিনী সেই ল্যাজ বিশিষ্ট চেয়ারে অধিষ্ঠিতা। ও হরি,এতক্ষন দেখিতে পাই নাই,পায়ে এষ্টাকিন । মাগী কে গো? এমন গুমোট গ্রীষ্মে দিনদুপুরে যে মেয়েমানুষ এষ্টাকিন এঁটে বসে থাকতে পারে তার কি অসাধ্য কিছু আছে?"[৫]

সেযুগে তাবৎ ব্যঙ্গ উপন্যাসের মধ্যে যোগেশচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনীর' প্রচার ছিল সর্বাধিক। যোগেন্দ্রচন্দ্র 'কালাচাঁদ', চিনিবাস চরিতামৃত', 'নেড়া হরিদাস', 'শ্রী শ্রী রাজলক্ষী প্রভৃতি উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'জ্যোতিদাদা' এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কয়েকটি হাস্য রসাত্মক রচনা লিখেছেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' রচনাটিকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর দ্বিতীয় হাস্যরসাত্মক রচনা "এমন কর্ম আর করব না"— পরে ‘অলীকবাবু’ নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের সরস পরিহাসের লক্ষ্য দুটি-মূর্খ অলীকের মিথ্যাভাষণ এবং নভেলী নায়িকা হেমাঙ্গিনীর রোমান্সপ্রিয়তা। ঘটনার পরম কৌতুকাবহ বৈচিত্র্য গদার দ্বারা ঘটেছে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে সামাজিক মতিভ্রমের বিষয়টিকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'হিতে বিপরীত' একটি বৃদ্ধ কৃপণের জব্দ হওয়ার কাহিনী। এই ব্যঙ্গকাহিনীতে নিছক হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ঘটনার অদ্‌ভুতত্বই এই হাস্যরসের মূল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'হঠাৎ নবাব' এবং 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' এই দুটি গ্রন্থ নাট্যকার মলিয়ের নাটকের অনুবাদ। গ্রন্থ দুটিতে নিপুণ হাস্যরসের সাথে ব্যঙ্গ মিশ্রিত আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মলিয়েরের অনুসরণে নাট্যসাহিত্যে যে প্রহসনের ধারা প্রবর্তন করলেন, অমৃতলাল সেই ধারারই নিপুণ পরিপোষক। হাস্যরসাত্মক নাটকের ধারায় তিনি "রসরাজ" নামে খ্যাত হয়েছিলেন। তরল ও হালকা জীবনের বিপর্যয় এবং বিকৃতির দিকেই অমৃতলালের তীক্ষ্ণ ও বক্রদৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তাঁর হাস্যরস তীব্র তীক্ষ্ণ চাবুকের ন্যায় পাঠককে আঘাত করে,সেই আঘাতের বেদনায় আমাদের স্বাভাবিক হাসি কাষ্ঠহাসিতে পরিণত হয়। ইংরেজিতে যাকে 'স্যাটায়ার' বলে তার অধিকাংশ নাটকই সেই শ্রেণীর। 'বিবাহ বিভ্রাট', 'বাবু', 'বৌমা’, 'একাকার' প্রভৃতিতে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ এর কাঁটাগুলি অতি তীক্ষ্ণ, অতি মর্মান্তিকভাবে আছে। 'বিবাহ বিভ্রাট' অমৃতলালের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রচনা। এর কাহিনীর মধ্যে তেমন জটিলতা নেই, কেবল নন্দের দ্বারা গোপীনাথকে প্রতারণার মধ্যে যে 'আইরনি' আছে, তাই উপভোগ্য! বিজাতীয় ভাবাপন্ন নব্যসমাজ এবং পুত্রের বিবাহে পণ আদায় করার অসঙ্গত জুলুম-এই দুটি বিষয়ের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে। 'বাবু' রচনার মধ্যে কোন অবিচ্ছিন্ন গতি

নেই। অমৃতলালের ব্যঙ্গ- বিদ্রূপ এখানে শুধু কঠোর নয়, হিংস্র বললেও অন্যায় হবে না। তাঁর পরিহাসের কথা বিস্ফোরকের টুকরোর মত প্রবল বেগে ছুটে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করেছে। লেখক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংস্কারপন্থী ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলন উভয় বিষয়ের বিকৃত এবং আসল মর্ম উদ্ঘাটন করেছেন।

'কৃপণের ধন' মলিয়েরের "দি মাইজার" নামক রচনার দ্বারা প্রভাবিত। কৃপণের ধনে হলধরের কার্পণ্য এবং নারী সম্পর্কিত দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়।

'খাস দখলকে' ব্যঙ্গাত্মক নাটক বলা না গেলেও এটি মোটামুটি প্রহসনধর্মী,ইংরেজিতে যাকে 'কমেডি অফ রোমান্স' বলা যায়। বিধবা বিবাহ যে নিতান্ত অসঙ্গত ও হাস্যকর বিষয় তা লেখক দেখিয়েছেন। তাঁর ‘তাজ্জব ব্যাপার’, ‘চাটুজ্যে বাড়ুজ্যে’, 'ডিসমিস', 'চোরের উপর বাটপারি' রচনাগুলিতে তীব্র ব্যঙ্গ ও হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে।

অমৃতলাল পরবর্তী উল্লেখযোগ্য হাস্যরচনাকার হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। মূলতঃ নাট্যকার হলেও তাঁর রচনায় ব্যঙ্গরসের প্রাধান্য দেখা যায়। তাঁর হাসির গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয় এবং প্রসিদ্ধ হয়েছিল এবং একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে এই শ্রেণীর রচনাগুলিতে কৌতুক এবং হাস্যরসের মূলে গানগুলির আবেদন সহজগ্রাহ্য। তাঁর প্রথম রচনা 'কল্কি অবতার'। এতে বিলেতফেরৎ, ব্রাহ্মণ, নব্য হিন্দু, গোড়াঁ এবং পন্ডিত- এই পাঁচ সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে। ঘটনা সংস্থাপনের মধ্যে এর হাস্যরস নিহিত। তাঁর রচিত 'প্রায়শ্চিত্ত,' 'বিরহ, 'ত্রহস্পর্শ, 'পুনর্জন্ম' প্রভৃতিতে স্থানে স্থানে হাসির টুকরো ছড়িয়ে থাকলেও অবিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য হাস্যরস তেমন ঘনীভূত হতে পারেনি। 'পুনর্জন্ম' রচনাটিতে জটিল ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে হাস্যরস উদ্রেক করাই লক্ষ্য হলেও তা সার্থক হয়নি। তবে 'পুনর্জন্মের' গৌরব তার বিষয়বস্তুর জন্য নয়, শিল্পোৎকর্ষের জন্য। দ্বিজেন্দ্রলালের এই শৈল্পিক সত্তা যদি সামাজিক প্রহসন বা নাটক রচনায় নিয়োজিত হতো তবে নাট্যসাহিত্য অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ হতো এবং হাস্যরসের রত্নখনিতে অনেক মূল্যবান রত্নের সংগ্রহ দেখতে পাওয়া যেত। রাজকৃষ্ণ রায় অনেকগুলি নাটক,ব্যঙ্গ কাহিনী রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রচনায় প্রাচুর্য থাকলেও উৎকর্ষ

তেমন কিছু ছিল না। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'টাটকা টোটকা', 'আগমনী বিজয়া', 'দ্বাদশ গোপাল'।

অমৃতলাল সমসাময়িক বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় অভিনেতা হিসেবে প্রভূত খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর ‘যুগমাহাত্ম্য’ প্রহসনটি উল্লেখযোগ্য। ব্যঙ্গনাট্য বা প্যারোডির মতো প্রহসনটি স্বচ্ছ, সরল ও তীক্ষ্ণ।

বাংলা সাহিত্যে যে দিকপাল প্রতিভাদের নিয়ে আলোচনা হয় তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন দত্ত ,ও দীনবন্ধু মিত্র অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীতে বিক্ষিপ্তভাবে হাস্যরসের পরিচয় আছে। তাঁর উপন্যাসসমূহের মানব চরিত্রের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেই হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনীর' 'গজপতি বিদ্যাদি গজ গজ' চরিত্রটি উপন্যাসে একটি হাস্যকর উপস্থাপনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর রচনারীতি বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতায় উজ্জ্বল। এছাড়া 'বিষবৃক্ষ' - এ স্ত্রীলোকদের কোন্দল ভ্রমরের অভিমানী কার্যকলাপ, স্থূল রসিকতার খোরাক হয়েছে। পরবর্তীকালে তাঁর হাস্যরসাত্মক রচনা থেকে স্থূলতা দূর হয়ে পরিবর্তে মার্জিত হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'কমলাকান্তের দপ্তর'। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'এবং 'লোকরহস্য' গ্রন্থ দুটিতেও হাস্যরসের পরিচয় আছে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মনুষ্য চরিত্র সৃষ্টির সর্বোত্তম সার্থকতার নিদর্শন আছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে। তবুও কমলাকান্ত তাঁর এক অভিনব রচনা। কমলাকান্তর চরিত্রের মূল উপাদান হল কৌতুক ও বেদনা। বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্ময়কর প্রতিভা আপাতবিরোধী উপাদানের সমন্বয় সাধন করেছে অবলীলাক্রমে। বাঙালি জাতিকে জীবনের মর্মার্থ শেখাতে গিয়ে বাঙালির দুর্দশায় তিনি সাশ্রুনেত্র। অশ্রুর উৎসে ব্যঙ্গের জন্ম হয়েছে এবং বেদনার ফলেই কৌতুক রস বা হাস্যরস চরিতার্থতা লাভ করেছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর ‘মনুষ্যফল’, 'বিড়াল', 'পতঙ্গ', 'ঢেঁকি', 'ফুলের বিবাহ', ‘কমলাকান্তের জোবানবন্দি','একটি গীত’ প্রভৃতি রচনায় কবিত্ব যতই থাক অবশ্যই আছে কিছু নাট্যগুণ এবং গল্পরস। ভাষা হাস্যরসকে অতিক্রম করে এক অনাস্বাদিত শিল্পসুষমায় মন্ডিত হয়েছে।[৬]

এবার নাটক ও প্রহসনের দিকে দৃকপাত করা যাক। রামনারায়ণ তর্করত্ন-এর ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ (১৮৫৪) বাংলাসাহিত্যের প্রথম প্রহসনমূলক ব্যঙ্গকাহিনী। সমসাময়িক কালের বাংলাদেশের

সমাজজীবনের সমস্যামূলক এই কাহিনীটির কৌতুকরস সেই আমলের দর্শক ও পাঠকদের আকৃষ্ট করেছিল। যদিও এর হাস্যরস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। সেদিনের হিন্দু বাঙালি সমাজে কৌলিন্য প্রথার মত একটি সামাজিক কদাচারের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশে ধীরে ধীরে প্রতিবাদী কন্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। কুলীন ব্রাহ্মণ কেশব চক্রবর্তী ৩২ ২৬,১৫ ও ৮ বছর বয়স্ক চারটি মেয়ের সঙ্গে ঘটকের কারসাজিতে এক বৃদ্ধ, শীর্ণ ,কদাকার, মূর্খ ও কানা বধির এক কুলীনের বিবাহ দিয়ে কিভাবে উক্ত চক্রবর্তী তার কুলের মান সম্মান বজায় রাখতে পেরেছিলেন তারই করুণকাহিনী। এই নাটক উদ্দেশ্যমূলক হলেও নাট্যকারের সহৃদয়তা ও মানবিকতা লক্ষ্য করা গেছে,যদিও ব্যঙ্গরসের প্রাধান্য খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। রামনারায়ণ পরবর্তীকালে 'উভয়,সংকট'(১৮৬৯), 'যেমন কর্ম তেমনি ফল(১৮৬৫) , 'নবনাটক' (১৮৬৬) প্রভৃতি কয়েকখানি ব্যঙ্গরসাত্মক কাহিনী রচনা করেন। তা যেমন খুব উন্নত ধরণের নয় তেমনই তাতে রামনারায়ণের মৌলিকত্ব দেখা যায়নি। মূলতঃ এই পর্বের ব্যঙ্গপ্রধান কাহিনীগুলি

কতকগুলি সামাজিক অসঙ্গতি, যেমন- কৌলিন্যপ্রথা, বিধবা বিবাহ, পণপ্রথা,, বারবনিতাসক্তি, লাম্পট্য ও মদ্যপান প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে রচিত করা হয়েছে।

রামনারায়ণ তর্করত্নের পর বাংলা নাট্যসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' 'ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে রচিত হয়। এই দুটি গ্রন্থ সার্থক সাহিত্য রসোত্তীর্ণ প্রহসনমূলক রচনা। প্রথমটিতে শিক্ষা ও সভ্যতার নামে তরুণ দলের স্বেচ্ছাচার ও দ্বিতীয়টিতে ধর্মের ধ্বজাধারী বৃদ্ধ জমিদারের লাম্পট্যকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।[৭] মধুসূদন প্রাণবন্ত সংলাপ, ঘটনা, পরিবেশগত ও চারিত্রিক অসংগতিকে বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। জীবনকে দেখার ও দেখাবার জন্য যে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন তাও তাঁর মধ্যে আছে। উভয় রচনাতেই লেখকের শৈল্পিক সংযমবোধ প্রশংসনীয়। পরিস্থিতি ও চরিত্রগত সাধারণ স্বাভাবিক অসঙ্গতি হাস্যরসসৃষ্টির মূল কারণ।

মধুসূদন দত্তের যথার্থ উত্তরাধিকারী হলেন দীনবন্ধু মিত্র। তিনি পাঁচখানি ব্যঙ্গপ্রধান গ্রন্থ লিখেছেন। তার মধ্যে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক, ও 'কুঁড়ে গরুর ভিন্নগোঠ','নবীন তপস্বিনী' অন্যতম।

দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) তে হিউমার সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। সহজাত বাস্তব গুণসম্পন্ন ও মানব প্রীতি থাকার ফলে হাস্যরস কিছু মাত্রায় ব্যাহত হয়েছে।

জামাই বারিক (১৮৭২) বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক কাহিনী। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘরজামাতা প্রথা ও বহুবিবাহ প্রথাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। এখানে সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিত্বময় চরিত্র অভয়কুমার ও কামিনী। আলোচ্যগ্রন্থে নাট্যকার তাঁর নাটকের পাত্র পাত্রীর জীবন যাত্রা নিয়ে হাস্য পরিহাস করতে করতে সহসা গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। হিউম্যানিস্টের নিরপেক্ষ উদার জীবনবোধ ও বাস্তবতাবোধ এই শিল্পীর ছিল, কিন্তু উচ্চাঙ্গের রসকল্পনার অভাবে তা পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। 'নবীন তপস্বিনী'র (১৮৬৩) জলধর উচ্চশ্রেণীর হাস্য-রসাত্মক চরিত্র। হাস্যরসের মধ্যেই করুণ রস এবং করুনরসের মধ্যেই হাস্যরসের সৃষ্টি-এই ধারণাকে পরিপুষ্ট করেছে।

'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) দীনবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক প্রহসন। স্যাটায়ার ও হিউমার উভয় রসের গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। এতে নিমচাঁদের মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিষ্ফলতার যন্ত্রণাকে বিষাদ ও কারুণ্যমিশ্রিত ব্যঙ্গবিদ্রূপ কৌতুকে উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে। এই ব্যঁঙ্গ নাটকটির নিমচাঁদ চরিত্রটি আমাদের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

এই যুগের অন্যতম নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'বেল্লিক বাজার' (১৮৮৭), 'ভোট মঙ্গল' (১৮৮২), 'যাইসা কি ত্যায়সা' (১৯০৭), 'আয়না' (১৯০২), 'বড়দিনের বকশিস', 'পাঁচকন্নে' প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক নাটক রচনা করলেও সাহিত্যরস গুনান্বিত মৌলিকত্ব দাবি করতে পারেননি।

অমৃতলাল বসুর অনুসরণে ব্যঙ্গধর্মী রচনা লিখে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। এঁদের রচনায় অবশ্য বিশেষ কোনও জীবনদৃষ্টির সন্ধান মেলেনা। ভূপেন্দ্রনাথের 'জোর বরাত'নাটকটি ব্যঙ্গধর্মী হলেও এটি কিছুটা গুরুগম্ভীর নাটক। তবে শেষ পর্যন্ত একে হাস্যরসাশ্রিত কমেডি বলেই অভিহিত করতে হয়। তাঁর 'কৃতান্তের বঙ্গদর্শন' অন্যতম ব্যঙ্গ নাটক। নাটকখানির মধ্যে কাহিনীর চমৎকারিত্ব বা চরিত্র চিত্রণের মাধুর্য বিশেষ কিছু নেই। 'বেজায় রগড়' ভূপেন্দ্রনাথের আরেকটি ব্যঙ্গার্থক রচনা। এটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলা যেতে পারে। মানুষের জীবনের সহনযোগ্য কিছু কিছু অসংগতি, বুদ্ধির মারপ্যাঁচ প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি নির্মল হাস্যরস পরিবেশন করেছেন।

নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত শিল্পের দিক দিয়ে অমৃতলাল-এর অনুগামী। 'হরিরাজ' এবং 'দলিতা কর্ণনী' বাদে তাঁর সবখানি নাটকই লঘু নাট্য প্রহসন। এছাড়া 'তিল তর্পণ' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

বাংলা নাট্যসাহিত্য তথা সমগ্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা গান- প্রবন্ধ-উপন্যাস-নাটক-ছোটগল্পের মতো তাঁর ব্যঙ্গধর্মী রচনা ও যথেষ্ট সার্থকতা মণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে অনেকেই হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী রচনা সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য অন্য সকল লেখকের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর প্রধান গুণ এর সুতীক্ষ্ণ সুস্নিগ্ধ ব্যঞ্জনাময় সংলাপ। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' স্বল্পায়তন রচনা মাত্র তিনটি দৃশ্যে এটি সমাপ্ত যা লেখকের কাছেও অতি প্রিয়। 'বৈকুণ্ঠের খাতার' মধ্যে হয়তো মূল্যবান সম্পদ আছে,কিন্তু অন্যলোকের তাতে আগ্রহ নেই, অথচ বৈকুন্ঠ সকলকে তা শোনাবেনই। কৌতুকরস বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যদি একই রকম অথবা বিপরীত ধরণের দুটি চরিত্রকে একত্রে সমাবেশ করা হয়। বৈকুন্ঠের সঙ্গে সঙ্গে যখন অবিনাশকেও নিজের লেখা শোনাবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখি তখন আমাদের হাস্য দ্বিগুণ বর্ধিত হয়।

'চিরকুমার সভা', 'শেষ রক্ষা', 'গোড়ায় গলদ', 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রহসনগুলিতে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। 'চিরকুমার সভা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রহসন। রৌদ্রালোকিত বৃষ্টিধারার ন্যায় বুদ্ধিদীপ্ত রুচির হাস্যরসের চিত্তাভিরাম লীলা সমস্ত গ্রন্থটিকে অশেষ প্রীতিপদ করে তুলেছে। বিদগ্ধ জনপ্রিয় বাক্যাবলীর চমৎকারী প্রয়োগে ,উপমা

রূপকের ঘনঘটায়, যমক- শ্লেষ অনুপ্রাসের ছটায় নাটকীয় কথাগুলি বিদ্যুৎপ্রভায় ঝলমল করছে। ক্ষণে ক্ষণে যেন নয়নে এরা ধাঁধার সৃষ্টি করে। 'চিরকুমার সভার' প্রধান গুণ এর অর্থময়, ধ্বনিময় সংলাপ,কিন্তু সংলাপের চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও এর কাহিনীর দুর্বলতা বিশেষ লক্ষণীয়। আলোচ্য প্রহসনে হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে প্রধানত অক্ষয় ও রসিকের চরিত্রের দ্বারা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'চিরকুমার সভা' আজও উল্লেখযোগ্য হাস্যরসাত্মক কাহিনী রূপে স্বীকৃত।

'শেষ রক্ষা' রচনাটি 'গোড়ায় গলদ' এর মার্জিত রূপ। চিরকুমার সভার অপূর্ব বাগবৈদগ্ধ্য এবং সূক্ষ্ম হাস্যরস এতে না থাকলেও ঘটনার বুনন এতে অধিকতর কৌশল পূর্ণ।
আলোচ্য প্রহসনের শেষাংশে সকলেরই শেষরক্ষা হওয়ায় সর্বজনীন প্রসন্নতাজাত কৌতুকরস আমাদের মনে তৃপ্তির সঞ্চার করে। তাঁর 'পঞ্চভূত' গ্রন্থটি বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের নিদর্শন। যথা- 'হিং টিং ছট', 'ধর্মপ্রচার', 'নব দম্পতির প্রেমালাপ' প্রভৃতি। নিটোল ঘটনা সংস্থাপনে উইট-প্রধান সংলাপের উজ্জ্বলতায় তিনি এই রচনাগুলিতে যে পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত এবং অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন তা অতুলনীয়। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে কৌতুকরসের প্রাবল্য কম। সুরুচিসম্পন্ন পরিবেশে বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যদীপ্ত সংযত অনুভূতি মিশ্রিত হাস্যরসই তাঁর প্রধান অবলম্বন। তাঁর হাস্যরসাশ্রিত রচনায় এক উদার সংযত সহনশীল ও ভূয়োদর্শী ও জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ছোটদের জন্য লিখিত সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' কৌতুক নাটকটি তাঁর ব্যঙ্গাশ্রিত হাস্যরসে পরিণত পাঠকদের মুগ্ধ করে। 'আবোল তাবোল', 'ঝালাপালা', 'লক্ষণের শক্তিশেল' নাটকগুলির অনাবিল হাস্যরস শুধু ছোটদের নয়,আবাল বৃদ্ধ-বনিতার নিকট আজও সমপরিমাণে উপভোগ্য।

বাংলা সাহিত্যে 'বীরবল' ছদ্মনামধারী প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় বাগবৈদগ্ধ্যের উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তার রচনায় উইট বা বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা শানিত ও সংহত বাকচাতুর্যাশ্রয়ী ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বা স্যাটায়ার যেভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাতে তাঁর ভাবালুতাবর্জিত, নির্মোহ, বিচারনিষ্ঠ মানসের বৈশিষ্ট্যই আমরা অনুভব করি। তাঁর অভিজাত রুচি নির্মল হাসির খোরাক না হলেও চিন্তাভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর 'চার ইয়ারি কথা',

'বীরবল', 'নীললোহিত'প্রভৃতি রচনায় উইট বা ব্যঙ্গ বিদ্রুপের সঙ্গে হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে,তবে তাতে বিশুদ্ধ হিউমারের স্পর্শ অনুভব করা যায় না।

রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে হাস্যরসসৃষ্টিতে মৌলিক কৃতিত্বের অধিকারী হলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। রূপকথাসুলভ কল্পনা বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা, অদ্‌ভুত রস, ব্যঙ্গকৌতুক,সমবেদনা, প্রভৃতির সমবায়ে তিনি 'কঙ্কাবতী', 'মুক্তমালা' 'ডমরু চরিত' প্রভৃতিতে যে নির্দোষ হাস্যরসের নির্ঝর প্রবাহিত করেছেন বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই বললেই হয়। তাইতো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

"এই অদ্‌ভুত রূপকথা ভালো করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোনও চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিনী কল্পনাকে এক নিগুঢ় নিয়মপথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই।......... রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্যসারল্য, তাহার অসন্ধিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নয়"।[৮]

'ডমরুধর' পৃথিবীর ব্যঙ্গসাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি। তার সমস্ত দুষ্কর্ম ও ঘোরতর নীচ স্বার্থপরতা সত্বেও তার সপ্রতিভতা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং নিজের সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচ সত্যসত্যভাষণের জন্য সে আমাদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় না। ফলস্টাফের দৈহিক স্থূলতা তার সমস্ত ফাঁকি, জুয়াচুরি ও মিথ্যা আত্মশ্লাঘা ও নিরঙ্কুশ রসিকতার নির্ভরযোগ্য আধার রচনা করেছে। ডমরুধরের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ, আত্মগর্বে স্ফীত নীচ মন তার সমুদয় কৌতুকের দুরবস্থা ও কল্পনার অনিয়ন্ত্রিত ভ্রমণবিলাসকে এক স্বাভাবিক আশ্রয়ের বৃত্তে রক্ষা করেছে।

সর্বজনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় হাস্যরসের বিশেষ কোনো স্থান ছিল না। কেবল 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কোন কোন স্থানে কৌতুকজনক চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনায় কিছুটা হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। শরৎচন্দ্রের হাস্যরস যথার্থ 'হিউমার'- এর পর্যায়ে পড়ে। তাঁর হাসি যেন অশ্রুর জমাট তুষাররাশি, জলভারাবনত মেঘের বুকে চঞ্চল বিদ্যুৎ-বিলাস। শরৎ-সাহিত্যে ব্যঙ্গরসের পরিচয় পাওয়া যায় বটে তবে সেখানেও অত্যাচারিত মানুষের প্রতি বেদনাবোধই অধিকতর সত্য হয়ে ওঠে। 'শ্রীকান্তর' প্রথম খন্ডে 'ছিনাথ

বহুরূপীর' চরিত্র বা দ্বিতীয় খন্ডে শ্রীকান্তর 'সাধুবেশ' ধারণের ঘটনা দুটি সে কথার সত্যতা প্রমাণিত করে।[৯]

হাস্যরসিক কথাসাহিত্যিক রূপে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর অধিকাংশ গল্পেই লঘু প্রসন্ন কৌতুকের আমেজ অনুভব করা যায়। 'নিষিদ্ধফল', 'সখের ডিকেটিভ', 'যুগল সাহিত্যিক', 'প্রণয় পরিণাম', 'বলবান জামাতা' 'রসময়ীর রসিকতা' প্রভৃতি গল্পগুলি সম্পূর্ণভাবেই হাস্যরস প্রধান। তাঁর 'রসময়ীর রসিকতা' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসপ্রধান গল্প। নারীর মনস্তত্ত্ব ,ভৌতিক রহস্যময় পরিবেশ, অনাবিল কৌতুক- এইসব উপকরণ মিলে গল্পটিকে রসোচ্ছ্বল ও উপভোগ্য করে তুলেছে। 'বলবান জামাতা'গল্পে নামের ভুল ও জামাতার দৈহিক পরিবর্তনের জন্য যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল নির্দোষ হাস্যরসের প্রবাহে তা পরিমার্জিত ও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। নলিনী নামের জামাতাটির চরিত্রে ক্ষমাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্পে যে রসসৃষ্টি হয়েছে তা একদিকে যেমন ঘটনার আকস্মিকতা প্রসূত, অপরদিকে তেমনই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও অভিব্যক্তি।

বাংলা হাস্যরসাত্মক গদ্যসাহিত্যে পরশুরাম বা রাজশেখর বসুর স্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও গৌরবোজ্জল। হাস্যজনক পরিস্থিতি ও পরিবেশের উদ্ভাবন নৈপুণ্য, বাস্তব সমাজজীবনের সকল প্রবাহ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন হাস্যরসাত্মক চরিত্র চিত্রণ বর্ণনায় নৈপুণ্য, সরস কৌতুকাবহ সংলাপ প্রভৃতি উপাদানে তাঁর 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলি', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'গল্পকল্প' প্রভৃতি গ্রন্থের গল্পগুলি হাস্যরসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। 'পরশুরাম' ছদ্মনামে খ্যাত রাজশেখর বসু 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পটিকে অবলম্বন করেই সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ধর্মীয় ভন্ডামি ও ভন্ড সাধুবাবাদের প্রতি ব্যঙ্গকৌতুকের শর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। গড্ডলিকা(১৯২৪) পরশুরামের প্রথম গল্পগ্রন্থ। এতে মোট পাঁচটি গল্প আছে। 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'চিকিৎসা সংকট', 'মহাবিদ্যা', 'লম্বকর্ণ', ‘ভূশন্ডীর মাঠে’। এই গ্রন্থের গল্পগুলি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক পরশুরামের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা স্বীকার করে নেয়। এই গল্পগুলোর মধ্যে যে উদ্ভট ও অপ্রাকৃত পরিবেশে অনাবিল হাস্যরসের অফুরন্ত ধারা প্রবাহিত হয়েছে বাংলা

সাহিত্যে তা সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁর অসামান্য উদ্ভাবনী শক্তি, কল্পনার প্রাচুর্য, বিপরীত চরিত্র সমাবেশের কৌশলে হাস্যরস সৃষ্টির সাবলীল কুশলতা আমাদের বিস্ময়ে অবাক করে তোলে। দৈনন্দিন নিয়মশাসিত অভাব, দৈন্যপীড়িত পৌনঃপুনিকতায় পিষ্ঠ জীবনে যে এত হাস্যরসের উপাদান সঞ্চিত আছে সেদিকে লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হাস্যরস যেখানে প্রবল বা উচ্ছ্বসিত নয়, মৃদু ও ঈষৎ স্ফুরিত সেখানেও পরশুরাম যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

পরশুরামের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ হল 'কজ্জলী' (১৯২৭)। এই গ্রন্থের গল্পগুলি- হল 'বিরিঞ্চিবাবা', 'জাবালি', 'দক্ষিণ রায়', 'কচি সংসদ', 'উলট পুরাণ'। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পটির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 'উলটপুরাণ' বিপরীত ছবি তৈরির জন্য খুবই উপভোগ্য হয়েছে। পরাধীন ভারতবাসীর ইংরেজি শেখার আগ্রহ, ইংরেজি আচার ব্যবহার অনুসরণ ও অনুকরণ কখনও কখনও অতি আগ্রহে হাস্যস্পদ হয়ে ওঠা, তার মনের দুঃখ অভিমান কান্ন-এ সমস্তয় ইংরেজ মানসিকতা আরোপিত হওয়ার ফলে এটি এক অনাস্বাদিত কমেডির সৃষ্টি করেছে। তাই শুধু হাসির গল্প নয়, এই গ্রন্থ দুটি চিত্রশিল্পের এক সার্থক সৃষ্টি বলা চলে। এছাড়া নিজস্ব নানা সরস মন্তব্য ও চমৎকারিত্বপূর্ণ টিকা টিপ্পনীর মাধ্যমেও সুন্দর হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। হাস্যরসকে আশ্রয় করে তিনি কিছু কিছু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যেগুলি বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে। যেমন-রটন্তী কুমার, গণ্ডেরিরাম, বাটপরিয়া, জিগীষাদেব প্রভৃতি।

প্রমথনাথ বিশীও হাস্যরসসৃষ্টিতে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, 'মৌচাকে ঢিল, 'পরিহাস বিজল্পিতম' প্রভৃতি নাটকে ব্যঙ্গ ও কৌতুক ঘনীভূত হয়েছে। নাটক ছাড়াও বহু গল্প ও কবিতাতেও তিনি যথার্থ হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।

সজনীকান্ত দাস ব্যঙ্গ কবিতা লিখে যশলাভ করেছেন। প্যারোডি কবিতায় তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলাকার 'চঞ্চলা' কবিতার প্যারোডি করলেন 'গদি' নাম দিয়ে—

"হে, প্রাচীন গদি
অদৃশ্য নিঃশব্দ তবতল
ছারপোকা দলে দল

চলে নিরবধি"

বাংলা সাহিত্যে আর একজন উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন পরিমল গোস্বামী। 'এক কলমী' ছদ্মনামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর লেখা 'ট্রামের সেই লোকটি', 'ব্ল্যাক মার্কেট' 'মারকে লেঙ্গে', বার ভূতের আসর, 'বৈবাহিক বৈচিত্র্য', 'প্ল্যান', 'সাধু হীরালাল', 'কাউকে বলো না', 'সিধে বনাম'বাঁকা পথ প্রভৃতি রচনায় তিনি রঙ্গ ও ব্যঙ্গের চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অধিকাংশ গল্পেরই প্রেরণা সমসাময়িক ঘটনা। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক ত্রুটি সম্বন্ধে পাঠকদের সচেতন করে তোলা। সংবাদ টিপ্পনি ও কৌতুকরস মিশ্রিত গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র হাস্যরসের জন্ম দিয়েছে। এর মধ্যে বৈবাহিক বৈচিত্র্য গল্পটি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। মুখার্জিবাবু ও ব্যানার্জিবাবু দুজনেই প্রচন্ড আমিষাশী। কিন্তু বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের সময় পরস্পর শুদ্ধাচারী সাত্ত্বিক ও নিরামিষাশী প্রমাণ করবার জন্য যে চেষ্টা করেন পরিণামে তা যে হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ও শেষে উভয়েই উভয়ের কাছে ধরা পড়েন তারই মজাদার গল্প এটি। এর মাধ্যমে ভন্ড সদাচারীর প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে।

বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় পর্যাপ্ত পরিমাণে হাসির গল্প রচনা করেছেন। অতি ক্ষুদ্র আয়তনের গল্পে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গহাসি ও অশ্রুতে মিশিয়ে এক অপূর্ব নাটকীয় সাহিত্যরস সৃষ্টি করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ছিলেন 'বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক'। তাঁর লেখায় 'যে রস আছে তা হল কৌতূহলের রস' ও সেইসঙ্গে সকৌতুকে 'হাততালি দিয়ে'ওঠার আনন্দ। 'উৎসবের ইতিহাস' হারামজাদী প্রভৃতি গল্পে তার স্বাক্ষর আছে। লঘু হাস্যরস ,তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আঙ্গিকের বৈচিত্র্য তাঁর গল্পসাহিত্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

তীব্র ব্যঙ্গ রচনায় কার্টুনিষ্ট ডা: বনবিহারী মুখোপাধ্যায়-এর নামও উল্লেখযোগ্য। 'বঙ্গবাণী' ও 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর অনুরাগী পাঠক-পাঠিকা কম ছিলেন না। যারা মাসের পর মাস 'বঙ্গবানীতে' 'দশচক্র' পড়ার জন্য উৎসুক থাকতেন, তারা 'শনিবারের চিঠিতে' ‘নরকের কীট’ ও সমান আগ্রহে পড়েছেন। 'সিরাজীর পেয়ালার' শাণিত ব্যঙ্গ পাঠ করে বাংলার

সধবা বিধবা মেয়েরা পাথর হয়ে গেছেন, ভাবনা আর বেশি এগোতে পারেনি তাদের ভীরু মনে।

বস্তুতঃ শনিবারের চিঠি সংশ্লিষ্ট এই সাহিত্যিক বন্ধুগোষ্ঠী মনে করতেন বুদ্ধিবৃত্তিকে আঘাত করে জব্দ করে ফেলাই হলো কৌতুকের মূল কথা। ট্রাজেডিতেও তাই হয় এবং এ দুয়ের অবস্থান অতি ঘনিষ্ঠ। তাই এঁদের ব্যঙ্গ রচনায় হাসি ও অশ্রু মিলেমিশে আছে একত্রে এবং কখনও তা সমাজের ভন্ডামি ও প্রতারণার প্রতি আঘাতে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরও বটে।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মূলতঃ হাস্যরসিক লেখকরূপেই খ্যাতি অর্জন করেন। কি ছোটগল্প, কি উপন্যাস-সর্বত্রই হাসির মধ্যে করুণরসের একটি গাঢ়তর সুর ধ্বনিত হয়েছে। দীর্ঘজীবী কেদারনাথ সুদীর্ঘ জীবনে চাকরিসূত্রে ব্যাপক ভ্রমণের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত কেরানির জীবন ও প্রবাসী বাঙ্গালীর জীবন অবলম্বন করে সুখ দুঃখে ভরা জীবনের বিচিত্র উপলব্ধি ও মানবচরিত্র সম্পর্কে যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা আহরণ করেছিলেন, সাহিত্যে তাই শিল্পরূপ লাভ করলো জীবনের প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পৌঁছে। হাস্যরসের অজস্র প্রাচুর্য ও প্রকাশভঙ্গির ঔজ্জ্বল্য তাঁর সমস্ত রচনার একটি মৌলিকত্ব দাবি করতে পারে। 'আমরা কি ওকে'(১৯২৭), 'কবুলতি' (১৯২৮) 'পাথেয়'(১৯৩০)'দুঃখের দেওয়ালি' (১৯৩২) ইত্যাদি গল্প গ্রন্থ ও 'শেষ খেয়া'(১৯২৫), 'গোষ্ঠীর ফলাফল' (১৯২৯), 'ভাদুড়ি মশাই' (১৯৩২), 'আই হ্যাজ'(১৯৩৫) ইত্যাদি উপন্যাসে এই ব্যাপক অভিজ্ঞতার সুপষ্ট পরিচয় বিদ্যমান।'কোষ্ঠীর ফলাফল' ও 'ভাদুড়ি মশাই'- এ দুখানি গ্রন্থ তাঁর প্রতিভার সার্থক নিদর্শন। 'কেদারনাথের হাস্যরসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হাস্যরসের সঙ্গে চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সুসংগতি এবং করুণরসের সমাবেশ যা কোথাও কোথাও চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছে'।[১০]

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলি অনাবিল প্রসন্ন কৌতুকে রসোজ্জ্বল। নির্মল হৃদয়ানুভুতি ও সুকুমার সৌন্দর্যবোধে সমৃদ্ধ। 'রানুর প্রথম ভাগ', 'রানুর দ্বিতীয় ভাগ', রানুর তৃতীয় ভাগ', 'সরস গল্প সংকলন', 'রানুর কথামালা', 'পোনুর চিঠি', 'বরযাত্রী', 'গণশার বিয়ে' হাস্যরসাত্মক রচনা হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। তাঁর লেখায় বিশুদ্ধ হিউমার বর্তমান। হাস্যরসিকের লঘু দৃষ্টিভঙ্গির অন্তরালে যে কবিসুলভ সৌন্দর্যবোধ ও দার্শনিকের

সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি প্রচ্ছন্ন থাকে, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাসে সেই কৌতুকের ছটায়ন কালজয়ী হয়েছে।

প্রধানত: গোয়েন্দাকাহিনী ও রহস্যরচনার লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু হাস্যরসাত্মক গল্পও লিখেছেন। তাঁর 'আরব্যসাগরের রসিকতা', 'পারমু', 'চুয়া চন্দন', 'কানু কহে রাই' , 'জাতিস্মর' প্রমুখ গল্পগ্রন্থগুলি সাবলীল সরস ও সুলিখিত। তাঁর রচনার নির্ভেজাল পরিহাস রসিকতা যে কোন দেশের সাহিত্যেই দুর্লভ।

অন্নদাশঙ্কর রায় হলেন সেই জাত শিল্পী, যাঁর রচনায় তীব্র আলোকছটার মতো বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক বিচ্ছুরিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলি আধুনিক জীবনের জটিল সমস্যাজর্জরিত মানবহৃদয়ের অতি সূক্ষ্মতা ও নৈপুণ্যে গড়ে উঠেছে। তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যেই তিনি সর্বাপেক্ষা অলক্ষিত কল্পনাকুশলতার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হতে পেরেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলনগুলির মধ্যে 'প্রকৃতির পরিহাস', 'দুকান কাটা', 'হাসন সখি', 'যৌবন জ্বালা', 'কামিনী কাঞ্চন', রূপের দায় ইত্যাদি গ্রন্থে হাস্যরসের একটি অভিজাত স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছেন। 'স্ত্রীর দিদি' প্রভৃতি গল্পে আদিরস সম্বলিত কৌতুকও যে কিরকম অমোঘ অস্ত্র হতে পারে তার এক অপূর্ব নিদর্শন।

হাস্যরস সৃষ্টিতে একালের সবচেয়ে বিচিত্রকর্মা লেখক মুজতবা আলী। সৈয়দ মুজতবা আলীর শিল্পরীতি তাঁর নিজস্ব এবং তাঁর এই অনন্যতা হল তাঁর রম্যরচনার মূল চাবিকাঠি। 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থে আফগানিস্তানের 'সূচিভেদ্য অন্ধকারের' বর্ণনা দিয়ে যে রসিকতার সূচনা করেছেন, 'চাচা কাহিনী', ময়ূরকন্ঠী, 'পঞ্চতন্ত্র', 'টুনিমেম', 'ভবঘুরে' ও অন্যান্য অজস্র রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর স্বতন্ত্র রুচির রশ্মি অবাধে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি ভাষাতত্ত্বের মত নীরস ব্যাকরণ কথাকেও তিনি অসাধারণ রসিকতা সহযোগে বিতরণ করেছেন। তার ব্যক্তিত্বের এমনই রসায়ন যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনায়ও ছত্রে ছত্রে কৌতুকের ছটা উদ্ভাসিত হয়েছে। কৌতুকবোধও যে শ্রদ্ধার অভিষেকে পরম মাধুর্যে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, মুজতবা আলীর রচনা তার প্রমাণ। নিজের রচনায় 'হাসন রাজার' পরিচয় দিয়েছেন। আমরা অর্থাৎ

পাঠকরা বুঝতে পারি তাঁর মর্মেও অনুরূপ 'হাসন রাজার' বাস- যে হাসন রাজা দুতিময় গতিশীল রমণীয় কথায় কৌতুকের তরীটি স্বচ্ছন্দে বেয়ে চলেন। বিক্ষুব্ধ জীবনস্রোতের উপর দিয়ে এই নিপুণ মাঝিটি যে কোন ঘূর্ণাবর্তকেই স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করতে পারে। দুর্ধর্ষ পাণ্ডিত্যও যে অনাবিল হাসির ছটায় সাধারণের কাছে উপভোগ্য হতে পারে মুজতবা আলীর রম্যরচনাগুলি তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। বার্লিন শহরের একটি হোটেল থেকে প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে স্বাধীন 'বাংলাদেশের জন্মবৃত্তান্ত' বিষয়ক রাজনৈতিক আলোচনা পর্যন্ত প্রত্যেকটি রচনাই অত্যন্ত সরস ও মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। এমনকি তাঁর 'দেশে-বিদেশে' রচনাটির মধ্যেও সারল্য ও প্রসাদগুণ আশ্চর্য রমণীয়তাগুণে হাস্যরস-সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

শিবরাম চক্রবর্তী ছোটদের জন্য যেমন, তেমনই বড়দের জন্য ও অজস্র কৌতুকরসসিক্ত গল্প রচনা করেছেন। তাঁর গল্পের কৌতুকরসের পরিস্থিতি সংস্থান 'ফান' বা 'যমক'-শ্লেষপূর্ণ বাকচাতুর্যের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভট রস বা কৌতুকরসের সংমিশ্রণে তাঁর রচনাগুলিকে তিনি উপভোগ্য করে তুলেছেন। তাঁর 'হর্ষবর্ধন গোবর্ধন', 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা', 'শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প' (সংকলন) প্রভৃতি রচনায় নির্মল হাসির প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর 'পেঁয়াজ থেকে পয়জার' গল্পটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এক কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা লেখককে একটি পাত্রের সন্ধান দিতে বলেন। পাত্রর গুণাবলী ব্যাখ্যার সময় পরস্পর যে বদ অভ্যাসগুলির পরিচয় পাওয়া যায় , তাতে পাত্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে হাসির উদ্রেক হয়। পরিশেষে কন্যার পিতা পাত্রটিকে বাতিল করতে বাধ্য হন।

রঙ্গরসের একটি বড় উৎস হল বন্ধুদের আড্ডা। আধুনিক কালের সাহিত্যে এই কৌতুকস্রষ্টা আড্ডাধারীদের মধ্যে দুজন খুব বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। এক প্রেমেন্দ্র মিত্র "ঘনাদা" ও দ্বিতীয় জন গৌরকিশোর ঘোষ ওরফে রূপদর্শীর "ব্রজদা"। বাংলা সাহিত্যে অদ্‌ভুত হাস্যরস সৃষ্টির ধারাস্রোতেই এদের আবির্ভাব। উদ্ভট কল্পনার আকাশে অবলীলায় বিহারকারী 'ঘনাদা'ও 'ব্রজদা' উভয়ই প্রচুর কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছেন বাংলা সাহিত্যে। তবে ঘনাদার গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র দিয়েছেন কারুকর্মের পরিচয় আর রূপদর্শীর রচনায় কৌতুক প্রায়শই ব্যঙ্গের মুগুরে পরিণত হয়েছে।

অনুরূপ ব্যঙ্গরসের কাহিনীকার হলেন 'অচলপত্র' খ্যাত নীলকন্ঠ তথা দীপ্তেন্দ্র কুমার সান্যাল। সাম্প্রতিক কালের এমন কোন ঘটনা ছিল না যার সম্বন্ধে তাঁর ব্যঙ্গবান নিক্ষিপ্ত হয়নি। শিক্ষা, ভাষা, বেতার, সঙ্গীত, রাজনীতি ও রঙ্গমঞ্চ সর্বত্রই ছিল তাঁর হাস্যরস রচনার আধার। ‘পাগল ভাল কর মা’ ও 'রাজপথের পাঁচালী' এর উদাহরণ।

পেশায় অধ্যাপক হলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রোমান্স' বইয়ের 'বৃক্ষারোহণ' পর্ব বা 'কাঁঠাল পর্ব' প্রভৃতি গল্প হাসির পাখায় ভর করে শরতের মেঘের মতো ভেসে যায়। ভারহীন কৌতুকের উচ্ছ্বলতায় গল্পগুলি হয়ে উঠেছে পরম উপভোগ্য। কিশোরসাহিত্যে 'টেনিদার' স্রষ্টা তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'সুনন্দর জার্নাল' বহু সমাদৃত। বাংলার রাজনীতির এক দুঃসহ আন্দোলন সময়ের এ এক আশ্চর্য দলিল। সমালোচক যথার্থই বলেছেন -

“সুনন্দর জার্নালে এই সময়ের অন্তর্বর্তী বাংলা ও বাঙালির এক সুন্দর ছবি ধরা পড়েছে।........ এই গ্রন্থ একাধারে এই সময়ের বাঙালির জীবন-ইতিহাস এবং সমাজের দর্পণ”।[১১]

এছাড়া 'চারমূর্তি' 'ভূত কপাট' ও তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা।

রম্য রচনার ক্ষেত্রে নির্জলা কৌতুকের উপহার দিয়েছেন শিবতোষ মুখোপাধ্যায় ও পরিমল গোস্বামীর সুপুত্র হিমানীশ গোস্বামী যথাক্রমে 'দিকবিদিক' ও 'বিলিতি বিচিত্রা' গ্রন্থে।

বিরূপাক্ষ ওরফে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'বিশ্বরূপ দর্শন' এর নাট্যরসসমৃদ্ধ রচনাবলী, রীতিমতো অম্লস্বাদে পাঠককে লুব্ধ করে।

ফাদার দ্যতিয়েন বিদেশি হলেও তাঁর বাংলা রচনা রীতিমত বিস্ময়ের। 'ডায়েরির ছেঁড়া পাতা' অথবা 'ফাদার দ্যতিয়েনের রোজনামচা' খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

রসিক ও নিরপেক্ষ ক্যামেরাম্যানের মতই পারিপার্শ্বিক ঘটনাক্রম এর ছবি কলমের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। 'নীললোহিতের চোখের সামনে', 'নীললোহিতের আয়না', 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার সুনিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন

যা কৌতুকরসে জারিত ও উপভোগ্য। কিশোরপাঠ্য 'ভয়ংকর সুন্দর', 'কাকাবাবু সিরিজ', 'সবুজ দ্বীপের রাজা' রচনাগুলিতে অভিযানমূলক কাহিনীর অন্তরালে হাস্যরসটিও বর্তমান। 'গরম ভাত 'ও নিছক ভুতের গল্প', 'দেবদূত', 'বার হাটের কানা কড়ি, 'একা এবং কয়েকজন' গ্রন্থগুলিতে সুনীলের কৌতুকপ্রবণ ধারাটি অব্যাহত আছে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় চলমান বাংলা সাহিত্যের শীর্ষদেশে এবং পাঠকের মনোলোকে যে কজন লেখক বিরাজ করছেন সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের একজন। শিশুদের জন্য তথা কিশোরদের জন্য তার 'বরদাচরণ,' 'গোঁসাই বাগানের ভূত' বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ্য। 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি', 'গোগল, 'বন্ধ দরজার ওপারে' অত্যন্ত মনোগ্রাহী।

সংখ্যায় অল্প হলেও যে সমস্ত লেখক বাংলা সাহিত্যকে হাস্যরসের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছেন তাঁর মধ্যে শংকরীপ্রসাদ বসুর 'নট আউট', হীরেন্দ্রনাথ দত্তর 'ইন্দ্রজিতের আসর', সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'রসে বশে', বুদ্ধদেব গুহর 'ঋজুদাসমগ্র', আশাপূর্ণা দেবীর 'হারজিৎ', 'পল্টুদার বড়দা', প্রভৃতি রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতি সম্প্রতি যে সমস্ত রচনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে তার মধ্যে তপন রায় চৌধুরীর 'বাঙালনামা', অশোক মিত্রর 'আপিলা চাপিলা', নীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'আত্মঘাতী বাঙালী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভগীরথ মিশ্র'র 'আমলাগাছি'-এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। সরকারি আমলাকে নির্দিষ্ট কাজের বাইরে যে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তা স্বীকার করেও সমাজের নৈতিকতা কোন কোন সময় যে হাস্যরসের বিষয়বস্তু হিসেবে স্বকীয়তা অর্জন করে এই গ্রন্থ তার উৎকৃষ্ট দলিল-

"প্রথমদিনেই বুঝে ফেললাম সরকারি কর্মচারিদের দাপটের ধরণ। প্রথমেই পড়লাম এক ঘুঘু পিত্তনের পাল্লায়।...... খুব তাচ্ছিল্যভরে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা দেখি।........খুব অবজ্ঞাভরে চোখ বোলালেন ওটার ওপরে। .... বললেন এখনও অবধি আমরা পোষ্টিং অর্ডার রেডি করতে পারিনি।..... মনে রাখবেন, আপনি 'প্রশাসনে

আসছেন।........ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রয়োজনে আপনাকে যখন খুশি যেখানে খুশি পাঠানো হতে পারে। এই সার্ভিসের ক্ষেত্রে 'নো' শব্দটাকে আমরা ডিকশনারি থেকে ছেঁটে দিয়েছি। "[১২]

'বাঙালনামা' আত্মজীবনী আকারে লিখিত হলেও এর মধ্যে লেখকের রসবোধ ও হাস্যরসের ফল্গুধারা প্রবাহিত। উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক হয়েও সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাপনের মধ্যেই হাস্যরসের উপকরণ যে নিহিত আছে তা লেখক মর্ম মর্মে উপলব্ধি করেছেন। তাই এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে পরিমিত ও কৌতুককর আবহাওয়া সৃষ্টি করে পাঠককে হাস্যরসে আপ্লুত করতে সফল হয়েছেন।

সরকারী উচ্চ-পদাধিকারী ও অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্র তাঁর 'আপিলা চাপিলা' গ্রন্থে সরকারি আমলার কার্যাবলী ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার মধ্যেও গদ্যের স্বচ্ছন্দ গতি ও রসপ্রিয়তার জন্য রচনাটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। নিছক রোজনামচা বা ডায়রী সুলভ না হয়ে এই গ্রন্থটি একটি সময় ও কালকে চিহ্নিত করেছে,যা সমসাময়িক জীবন ও রাজনৈতিক পরিবেশকে অতিক্রম করে চিরকালীন কৌতুক ও অভিজাত রসবোধের পরিচয় প্রদান করেছে।-

"এখন মনে হয় গোটা জীবনখানাই ছড়াটির মতো।.... আমার এই ছন্নছাড়া আয়ুষ্কালে কাছে-আসা সরে-যাওয়া আপিলা-চাপিলাদের নিয়ে একটু জটলা করার শখ। আমি কি অমার্জনীয় অপরাধ করতে চলেছি? [১৩]

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'আত্মঘাতী বাঙালী' হাস্য-রসাত্মক রচনা না হলেও বাঙালি জাতির ঐতিহ্য, শিক্ষারীতি ও সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করার পিছনে যে প্রচ্ছন্ন অহমিকাবোধ বর্তমান, তা লেখক সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও শ্লেষ বিদ্রুপের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।- 'আজ বাঙালী জীবনে যে জিনিসটা প্রকৃতপক্ষেই ভয়াবহ সেটা এই -..... জাতির মৃত্যুশয্যার চারিদিকে ধনগর্বে উল্লসিত বাঙালী-প্রেত ও প্রেতিনীর নৃত্য'।[১৪] ব্যতিক্রমী রচনার মধ্যেও নিজস্ব রচনাভঙ্গি ও কৌতুকরস বর্তমান। তাই গ্রন্থটি জীবনের মূল্যবোধ ও বাস্তব হাস্যরসমিশ্রিত হওয়ায় স্যাটায়ার ধর্মীরূপে পরিগণিত।

বাংলা হাস্যরস প্রধান ও ব্যঙ্গরচনার ক্ষেত্রে বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলির অবদানও কম নয়। এই বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। ঐ সময় যে

পত্রিকাগুলি এক নতুন প্রাণপ্রবাহের ধারা এনেছিল তার মধ্যে 'কল্লোল', 'শনিবারের চিঠি', ‘নারায়ণ’, 'সচিত্র ভারত', 'বনবাণী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'অলকা'প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পুরনো প্রচলিত ধারার প্রতি তীব্র অনীহা ও বিদ্রোহ ঘোষণা করে এরা নতুন যুগের মশাল জ্বালানোর জন্য সচেষ্ট হলেন। রবীন্দ্র শরৎচন্দ্র বাহিত সুগভীর 'প্লেটনিক' প্রেমচেতনার সঙ্গে দেহজ কামনার জটিল নিগূঢ় সম্পর্ককে অবচেতনার মাধ্যমে নতুন তাৎপর্য দান,নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের সংশয়- সংগ্রাম ও আনন্দ-বেদনার অপরূপ রূপকথা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে বহতা ধারায় আলোড়ন সৃষ্টির প্রয়াস এক নতুন দিক উন্মোচন করলো। 'কল্লোল', 'কালিকলম’, 'উত্তরা', 'ধূপছায়া' প্রভৃতি একত্রিত গোষ্ঠী। অপরদিকে 'শনিবারের চিঠি' ও 'রবিবারের লাঠি' পত্রিকাগুলি পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করে পাঠকদের হাসির খোরাক হয়েছিল। এই পর্বে আমরা 'আশালতা সিংহ', শশিশেখর বসু, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, সজনীকান্ত দাস,প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ী, প্রভৃতি লেখকের সংস্পর্শে আসি। এমনকি সমালোচক ও কবি মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুল ইসলামের পরস্পর তীব্র বাদানুবাদ প্রত্যক্ষ করা যায়। এই পত্রিকাগুলিতে যুগের দাবি এবং সহনশীল আক্রমণ ও কৌতুকরসাশ্রিত সৃজনশীলতা প্রভৃতিও অনুশীলিত হয়েছিল। এই পর্যায়ে বিভিন্ন হাস্যরসাত্মক গল্প-কবিতা তির্যক কটাক্ষ, উপহাসের উতরোল এবং শুচিস্নিগ্ধ হাস্যরসই প্রধান হয়ে উঠেছে।

আধুনিক জীবনের জটিলতা ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলা যায় যে অভাবিত পূর্ব সমস্যা ও দুরবস্থায় হাস্যরসাত্মক রচনার অনেকটা স্তিমিত রূপ দেখা যায়। জাতীয় জীবনের নানা বিপর্যয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে মানুষের জীবনের সহনশীলতা ও রসবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। তাই স্বাভাবিক সুস্থতা বা নিরুদ্বিগ্নতা ফিরে না এলে স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসের প্রবাহন সম্ভব হবেনা। তাই এই মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের স্রোত শীর্ণ। টিকা- টিপ্পনী,সরস মন্তব্য ও বাকচাতুর্যের মধ্যেই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের হাস্যরস সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

গ্রন্থসুত্র-

১) গুপ্ত, বিজয়, পৃষ্ঠা ৬৭

২) চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০

৩) দত্ত, ভবতোষ, পৃষ্ঠা ৩০

৪) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, পৃষ্ঠা ৪৮,

৫) বসু, যোগেন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৬৮

৬) চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, পৃষ্ঠা ১২৫

৭) দত্ত, মধুসূদন, পৃষ্ঠা ৯

৮) মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ, ভূমিকা অংশ

৯) চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, পৃষ্ঠা ২২

১০) ঘোষ, অজিতকুমার, পৃষ্ঠা ৩৬৩

১১) গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ভুমিকাংশ

১২) মিশ্র, ভগীরথ, পৃষ্ঠা ১৭-১৮

১৩) মিত্র, অশোক, পৃষ্ঠা প্রাককথা

১৪) চৌধুরী, নীরদ চন্দ্র, পৃষ্ঠা ১১

গ্রন্থপঞ্জী-

১) গুপ্ত, বিজয়। *পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল।* বাণী নিকেতন, বরিশাল বাংলাদেশ, ১৩০৩।

২) চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম। *কবিকঙ্কন চন্ডী।* বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সুকুমার গুহ মজুমদার, ১৩৭০।

৩) দত্ত, ভবতোষ (সম্পাদনা)। *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব।* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০২৩।

৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা।* ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা, প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক, ১৯৬৭।

৫) বসু, যোগেন্দ্রনাথ। *মডেল ভগিনী বঙ্গবাসী পত্রিকা।* ১৮৮৬, যোগেন বসু, কলকাতা, ১৮৮৬-৮৯।

৬) চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। *'কমলাকান্তের দপ্তর' (বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ)।* পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৭৩, কলকাতা, ১৮৭৫।

৭) দত্ত, মধুসূদন। *'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো'।* মধুসূদন রচনাবলী, বসুমতি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮৫৯।

৮) মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ। *কঙ্কাবতী।* প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য পরিষদ, ১৮৯২।

৯) চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। *শ্রীকান্ত প্রথম খন্ড।* এম সি সরকার, কলকাতা, ১৯১২।

১০) ঘোষ, অজিতকুমার। *বঙ্গ সাহিত্যের হাস্যরসের ধারা।* করুণা প্রকাশনী, ১৯৮০।

১১) গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। *সুনন্দর জার্নাল অখণ্ড সংস্করণ।* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২।

১২) মিশ্র, ভগীরথ। প্রথম প্রকাশ, *আমলাগাছি।* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,২০১৫।

১৩) মিত্র, অশোক। আষাঢ়, *আপিলা চাপিলা।* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,১৩৬৬।

১৪) চৌধুরী, নীরদ চন্দ্র। *আত্মঘাতী বাঙালী।* প্রথম প্রকাশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৮।